সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ›› তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ›› জুন ২০১৭ ›› পাঁচ টাকা

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র: মুক্তি দিয়েছিলো শ্রমিকদের পৃষ্ঠা ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশন পৃষ্ঠা ৪

'শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব: শীর্ষক আলোচনা সভা পৃষ্ঠা ৫

সরকারের ছত্রছায়ায় চালের দাম বাড়ছে পৃষ্ঠা ৭

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের বসতবাড়ীতে আগুন ও পুড়িয়ে হত্যার জন্য দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি

গত ৪ জুন বাসদ(মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে লংগদুতে পাহাড়ীদের ওপর হামলা ও বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেবার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন । তিনি বলেন, একজন আওয়ামী লীগ নেতার হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে সেখানে যে তাণ্ডব চালানো হয়েছে তা অনভিপ্রেত ও নিন্দনীয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মৃত্যুর জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য আইন, আদালত আছে এবং তার মাধ্যমেই এর মীমাংসা কাম্য। সেটা না করে যেভাবে তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, যেভাবে তাদের উচ্ছেদ এবং হত্যা করা হয়েছে তা জাতিগত নিপীড়ন এবং বাঙালী জাত্যাভিমানের প্রকাশ। তিনি সেখানে প্রশাসনের ভূমিকারও নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে এই ঘটনার জন্য দায়ীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

মেগা লুটপাটের মেগা বাজেট

ভ্যাট ও করের বোঝায় বাড়বে জীবনযাত্রার খরচ

অর্থমন্ত্রী যখন তার জীবনের 'শ্রেষ্ঠতম' বাজেট পেশ করার কৃতিত্ব ঘোষণায় সোচ্চার তখন মানুষের মুখে মুখে পুরো বাজেট ছাপিয়ে দুটি কথা বেশ আলোচিত হচ্ছে। একটি চালের দাম বৃদ্ধি আর দ্বিতীয়টি হল ব্যাংকে ১ লক্ষ টাকা থাকলেই কেউ বড়লোক বলে গণ্য হবে কিনা!

সাধারণ মানুষের আলাপচারিতায় ক্ষোভ, কৌতুক ও ব্যঙ্গ মেশানো নানা প্রশ্ন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে : যার কাছে চার হাজার কোটি টাকা কোনো টাকাই নয় তিনিই আবার বলছেন ব্যাংকে ১ লক্ষ টাকা থাকলেই তিনি বড়লোক!

অনেকের নিশ্চয়ই মনে আছে, সরকারি সোনালি ব্যাংক থেকে হলমার্ক গ্রুপ দুর্নীতির মাধ্যমে চার হাজার কোটি টাকা লোপাট করার ঘটনায় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, "চার হাজার কোটি টাকা কোনো বড় অঙ্কের অর্থ নয়।" (প্রথম আলো, ০৫.০৯.১২) সেই অর্থমন্ত্রীই যখন বলেন, ব্যাংকে ১ লক্ষ টাকা আমানত থাকলে তিনি বড়লোক এবং তাকে আগের চেয়ে বেশি আবগারী শুল্ক দিতে হবে তখন মানুষ বুঝতে চাইছে – এ কি কৌতুক নাকি উপহাস!

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য কৌতুক নয় বরং উপহাস হিসাবেই দেখছে মানুষ। আর সেই উপহাসের জবাবে কেউ কেউ কৌতুক করেই বলছে, যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়ছে, বাড়ি ভাড়া বাড়ছে, জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে, সেই খরচ সামাল দিয়ে কোনো সৎ মানুষ ব্যাংকে ১ লক্ষ টাকা রাখতে পারলে বাস্তবিকই তিনি বড়লোক!

এই কৌতুকের মধ্যেই বর্তমান বাজেটের একটি মূল্যায়নও পাওয়া যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী ৪ লাখ কোটি টাকার যে বাজেট ঘোষণা করেছেন তা অতীতের যে-কোনো বাজেটের তুলনায় আকারে বিশাল। কিন্তু এই বিশাল বাজেট যখন ঘোষিত হচ্ছে তখন দেশের আর্থিক খাতের সার্বিক চিত্রটি কেমন? ওয়াকেবহাল মানুষ মাত্রেই জানেন, অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের আর্থিক খাতে এখন বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা। ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ ক্রমাগত বাড়ছে, ব্যাংক তহবিল লোপাটের মহামারি চলছে। বিদেশে টাকা পাচারও অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে। এ সময় দেশের কর্মসংস্থান, রপ্তানি, প্রবাসী আয়, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ – সব কটির প্রবৃদ্ধির ধারা স্থবির অথবা নেতিবাচক। এর মধ্যেই মেগা মেগা (অর্থাৎ বিশাল বিশাল) প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে ঘোষিত হলো আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দুর্গত হাওড়বাসীর দুর্গতির শেষ কোথায়?

অকালবন্যায় ভেসে গেছে সুনামগঞ্জের হাওরগুলো। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা এসেছে অনেক। বিভিন্ন দিক থেকে এসেছে বিভিন্ন মূল্যায়ন। তবে এও ঠিক যে, প্রথমদিকে যে তোলপাড় ছিলো তা এখন অনেকটা স্তিমিত। একই বিষয় দীর্ঘদিন সংবাদপত্রের প্রথম পাতা জুড়ে থাকে না। নতুন নতুন বিষয় আসে। নতুন খবর আলোচনার টেবিলে জায়গা নেয়। পুরনো বিষয় ধীরে ধীরে সরে যায়। সয়ে যায়। হঠাৎ জেগে ওঠা নাগরিক আবেগও ম্রিয়মান হয়। কোনরকমে টিকে থাকার জন্য বিষম লড়াইয়ের জীবন মানুষকে বসে থাকতে দেয় না। থিতু হতে দেয় না। এ নাহলে সে দেখতে পেতো যে, একটা ভয়াবহ দুর্যোগের পর একটা গোটা জনগোষ্ঠীর জীবন কিভাবে ওলটপালট হয়ে যায়।

হাওরের কান্না থেমে নেই। থামবেও না এতো সহজে। এ বিরাট অঞ্চলের হাজার হাজার পরিবারের মধ্যে কোন একটি পরিবারও বোধ হয় আজ অবশিষ্ট নেই যাকে এবারের ভয়াবহতা স্পর্শ করেনি। কাল যে ছেলের স্কুলে পরীক্ষা ছিলো, আজ সে বাবার হাত ধরে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। হালের গরু, ঘরের হাঁস-মুরগী সবই বিক্রি করে দিচ্ছেন গৃহস্থরা। ঘরে মানুষের খাবার নেই, পশুদেরকে কি খাওয়াবেন। এটা একদুইজনের ক্ষেত্রে ঘটছে না, দলে দলে লোক গ্রাম ছাড়ছে। কোনরকমে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে। এতবড় Mass migration এ সময়ের মধ্যে এখানে আর হয়নি, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কোথাও হয়েছে বলেও আমাদের জানা নেই।

সুনামগঞ্জের ইউপি চেয়ারম্যানরা পরিচয়পত্র স্বাক্ষর করছেন একের পর এক। কারণ গার্মেন্টসে চাকরি পেতে হলে পরিচয়পত্র লাগে। এসব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ লেখালেখি হয়েছে। পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে কাঁদছেন এক কৃষক। বড় মেয়েটা ক্লাস টেনে পড়ে, ছেলেটা ক্লাস সেভেনে। সবচেয়ে ছোট যে মেয়েটা সে পড়ে ক্লাস ফোরে। হু হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়া এই পিতা কিছুদিন আগেও *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মেগা লুটপাটের মেগা বাজেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকা দেয় কে, টাকা খরচ হয় কোথায়?

সরকার এক বছরে কোন খাত থেকে কত টাকা সংগ্রহ করবে আর কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করবে সেই হিসাবটাই হল বাজেট। প্রশ্ন হল, সরকার টাকা পায় কোথায়? এই টাকা যোগান দেয় জনগণ। বিভিন্ন কর ও শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের মাধ্যমে সরকার জনগণের কাছ থেকেই এ টাকা সংগ্রহ করে, যা রাজস্ব আয় হিসেবে দেখানো হয়। আর সেই রাজস্ব আয়ের বড় অংশ খরচ হয় সরকারের প্রশাসনিক কাজে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তির বেতন-ভাতায়, সেনাবাহিনী-পুলিশ-র‍্যাবসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের খরচ চালানোতে। এর নামই রাজস্ব ব্যয়। এর বাইরে সরকার নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেয় হয়, যাতে বড় খরচ হয়। এটাকেই বলে উন্নয়ন ব্যয়। ব্যয়ের জন্য যে অর্থ দরকার, তা যদি এই রাজস্ব থেকে না আসে তাহলে সরকার ঋণ করে। দেশের ভেতরে কিংবা দেশের বাইরে থেকে সরকার ঋণ নেয়। এ ঋণের আসল ও সুদ দুটোই পরিশোধ হয় আবার জনগণের কাছ থেকে নেয়া কর বা শুল্কের টাকা থেকেই। এর বাইরে কিছু অনুদান আসে বিভিন্ন দেশ বা সংস্থা থেকে যা প্রধানত প্রকল্প-ভিত্তিক।

তাহলে যে সাধারণ মানুষ কর, ভ্যাট দিয়ে সরকারের তহবিল গঠন করে, বাজেটে তার জন্য কত বরাদ্দ থাকে? যে কেউ খোলা চোখে তাকালেই দেখতে পাবেন, রাজস্ব ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ চলে যায় প্রশাসনিক ব্যয়ে। অর্থাৎ যারা জনগণের সেবা করার দায়িত্ব পালন করবেন তাদের পেছনে! বাড়ির মালিকের চেয়ে বাড়ির কেয়ারটেকার ও পাহারাদারের জন্য খরচ বেশি হলে সেটাকে কি বলা যায়?

দ্রব্যমূল্য ও বাজেট

রোজার সময় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, এর কোনো প্রতিকার সাধারণ মানুষ দেখে না। বাজারে মোটা-চিকন সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে গড়ে ৮ থেকে ১২ টাকা। গত প্রায় দেড় মাস ধরে এই বাড়তি দামে মানুষ চাল কিনছে। এর ফলে প্রতিটি পরিবারকে বাড়তি টাকা গুণতে হচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম। সেই বাড়তি খরচও যুক্ত হয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়ে। বর্তমান বাজেট কি এই দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করবে নাকি দ্রব্যমূল্যের আগুনে নতুন করে ঘি ঢালবে?

বাজেট ঘোষণার পর এফবিসিসিআই, ঢাকা চেম্বার, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, চট্টগ্রাম চেম্বার এবং বিসিআইয় এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে, প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়িত হলে তা মূল্যস্ফীতি বাড়াবে। (প্রথম আলো, ০৪ জুন ২০১৭) খেয়াল করুন, সাধারণ মানুষ নয়, শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরাই বলছে যে এ বাজেটের ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়বে অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম বাড়বে।

প্রস্তাবিত বাজেটে নতুন করে ভ্যাটের আওতা সম্প্রসারিত করা হয়েছে অর্থাৎ নতুন নতুন পণ্যকে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে। এই নতুন তালিকায় আছে কাপড়চোপড়, চা, বোতলজাত পানি, টুথপেস্ট, ব্রাশ, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এগুলোতে দিতে হবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট। বিদ্যুৎ বিলেও আগের চেয়ে বেশি ভ্যাট দিতে হবে। খরচ বাড়বে রেস্তোরার খাবারে এবং বিমান ও এসি রেল-বাস-লঞ্চের ভাড়ায়।

'মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন' ২০১২ সালে করা হলেও ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে তা বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা হয়েছিল। সেই আইনে কিছু সংশোধনী এনে, ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে রক্ষা করে এবং ক্রেতা-ভোক্তা স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চলতি অর্থবছর থেকে বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম গত ৬ এপ্রিল '১৭ দৈনিক প্রথম আলোকে বলেন, ১৫ শতাংশ মূসক অনকে দেশের তুলনায় বেশি। আমাদের সার্বিক মাথাপিছু আয়ও কম। আর মূসক শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের ওপরই পড়ে।"

আরো কিছু অসঙ্গতি

(ক) ঘাটতির বোঝা জনগণের ঘাড়ে : অর্থমন্ত্রী যে ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট দিয়েছেন, তার এক-চতুর্থাংশের বেশি টাকা তাকে জোগাড় করতে হবে ধারকর্জ করে। বর্তমান বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৬ হাজার ৭৭২ কোটি টাকা। ঘাটতি মানে হল, এ টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা জানা নেই। প্রস্তাবিত বাজেটে বিদেশি সহায়তার পরিমাণ ৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি দেখানো হয়েছে, যা প্রায় অসম্ভব। এই যে ঘাটতি এবং বিদেশি সহায়তা, যা অনিশ্চিত, সেটা কীভাবে পূরণ করা হবে? অতীতের নজিরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ঘাটতি পূরণ করা হয় জনগণের জন্য বরাদ্দ থেকে ব্যয় কমিয়ে। অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণপরিবহন ইত্যাদি খাত থেকে খচর কমিয়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

(খ) খেলাপি ঋণ : বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত এখন সবচেয়ে বড় ঝুঁকির জায়গা। বিশেষ করে, সরকারি ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে। ঘাটতি পূরণের জন্য জনগণের করের টাকা খরচ করা হচ্ছে। অথচ খেলাপি ঋণ নামের কোনো শব্দই বাজেটে নেই।

(গ) জ্বালানি খাতে দ্বিমুখী নীতি : জ্বালানি খাত একটি সমস্যা কবলিত খাত। আমরা যেসব তেল-গ্যাস-কয়লা ব্যবহার করি, যেগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়, সেগুলোর পরিমাণ কমছে। একই সাথে কয়লা পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই সারা পৃথিবী জুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষত সৌরশক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব বেড়েছে। জ্বালানি সংকটের কথা আমাদের সরকারও বলছে। কিন্তু বাজেটে দেখা গেল উল্টো নীতি নেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট সৌরবিদ্যুতের প্যানেলের ওপর প্রায় ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক ও কর আরোপ করা হয়েছে।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, যার ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ হাজার মেগাওয়াট হবে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। কিন্তু বাজেটের এই কর প্রস্তাব কার্যকর হলে সরকারের ওই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অসম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিদ্যুৎসচিব প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, বাজেটে এই কর আরোপের বিষয়টি তার জানা নেই। কারণ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাকে এ-সংক্রান্ত কোনো আলোচনায় ডাকা হয়নি। (৬ জুন ১৭)

তেলা মাথায় তেল

বাংলা একটি প্রবচনে বলে, তেলা মাথায় ঢালো তেল, শুকনা মাথায় ভাঙো বেল। বর্তমান বাজেটে তেমন নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। যার একটি উদাহরণ হল পোশাক শিল্পে বা গার্মেন্ট খাতে কর কমানো আর ব্যাংকের গচ্ছিত টাকার ওপরে আবগারি শুল্ক বাড়ানো এবং করমুক্ত আয়সীমা অপরিবর্তিত রাখা।

ব্যাংকের গচ্ছিত টাকার ওপরে এমনিতেই সুদের হার কম। চলতি হিসাবে সুদের হার ৩-৪ শতাংশের মতো, আর চলতি অর্থবছরে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৫ শতাংশের মতো। বাজেটের নতুন প্রস্তাবের ফলে ব্যাংকে ১ লাখ টাকার বেশি থাকলেই আগের চেয়ে বেশি শুল্ক দিতে হবে। আগে এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ টাকার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা। এখন সেটা ৮০০ টাকা করা হয়েছে।

আবগারি শুল্ক হিসাব করা হয়, সারা বছরে কোনো গ্রাহকের হিসাবে কোনো এক দিন সর্বোচ্চ কত টাকা ছিল। এর মানে হলো, কারও হিসাবে টাকার পরিমাণ বাড়তে পারে, আবার কমতেও পারে। কিন্তু সর্বোচ্চ বেড়েছিল যেদিন, সেদিনের পরিমাণটির ওপর আবগারি শুল্ক বসে। বছরে একবারই দিতে হবে হিসাব গ্রাহককে। অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা জমা রাখা বা সঞ্চয় করতে মধ্যবিত্তদের আরো বেশি শুল্ক দিতে হবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এতে সীমিত আয়ের মানুষ চাপে থাকবেন। কেননা, চলতি অর্থবছরে গড়ে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৫ শতাংশের মতো ছিল। এর মানে, করমুক্ত আয়সীমার কিছু ওপরে যারা ছিলেন, তাদের জীবনযাত্রায় খরচ সাড়ে ৫ শতাংশের মতো বেড়েছে। একদিকে মূল্যস্ফীতির জন্য বাড়তি টাকা খরচ হয়ে গেছে, সামনে একই হারে করও দিতে হবে। এতে সামগ্রিকভাবে ছোট করদাতার খরচ বাড়বে, সঞ্চয় কমবে।

এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের করের আওতায় আনা হয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানো হয়েছে। এ দুটি পদক্ষেপই মধ্যবিত্ত সীমিত আয়ের মানুষের জন্য চাপ হিসাবে আসবে।

মেগা লুটপাটের মেগা বাজেট!

অর্থমন্ত্রী একটি মেগা বাজেট দিয়েছেন। এই মেগা বাজেটে মেগা মেগা কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে। আর আমাদের দেশে মেগা প্রকল্প মানেই মেগা লুটপাট – এটা সবাই নিঃসংশয়ে মেনে নিতে বাধ্য। আমাদের দেশ হচ্ছে সেই দেশ যেখানে রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্যয় দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি।

এমনই একটি উদাহরণ হানিফ ফ্লাইওভার। বিপুল অর্থ খরচ করে একটা এত বড় অবকাঠামো তৈরি করা হলেও ফ্লাইওভারটির নিচের রাস্তাটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। একই কথা প্রযোজ্য মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নিয়েও। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও এই ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হয়নি। এর ব্যয়ও কয়েক দফা বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন সময় এসব ফ্লাইওভার নির্মাণ নিয়ে পত্রপত্রিকায় বহু প্রতিবেদন এসেছে। কিন্তু সেগুলোর কোনো সদুত্তর সরকারের তরফ থেকে দেয়া হয়নি।

সরকার যেসব মেগা প্রকল্পে মেগা পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে তারই কয়েকটি হল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এসব প্রকল্পের ব্যয় দফায় দফায় বাড়ানো হয়েছে। তার সাথে এসব প্রকল্পের উপযোগিতা এবং ব্যয় নিয়ে কোনো জবাবদিহিও নেই। আর রামপাল কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপযোগিতা নিয়ে মানুষের মনে গভীর সংশয় বিরাজ করছে। এই প্রকল্প বাংলাদেশের রক্ষাকবচ বলে পরিচিত সুন্দরবনকে ধ্বংস করবে – এমনটাই বিশেষজ্ঞদের আশংকা। সেসব আমলে না নিয়ে জনগণের লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের তোড়েজোড়ে চলছে। আর এর ফলে ধ্বংস হবে জনগণের সম্পদ সুন্দরবন।

অর্থমন্ত্রী তার জীবনের শেষ বাজেট এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাজেট পেশের কৃতিত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কোনো সুখবর তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমাদের অর্থনীতির জন্য এরই মধ্যে তিনটি বড় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। সেগুলো হলো বিনিয়োগ স্থবিরতা, বাস্তবায়ন অদক্ষতা ও কর্মসংস্থানের খরা। এগুলো সমাধানের কোনো রূপরেখা তিনি বাজেটে হাজির করেননি। আর তাই অর্থমন্ত্রীর মেগা বাজেট শেষ পর্যন্ত মেগা লুটপাটের বাজেট হিসাবেই দেখা দেবে।

'শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব: আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

(৫ম পৃষ্ঠার পর) সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধী।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এক দুঃখজনক সময়ে আমরা নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন করছি। মানবসভ্যতায় নতুন এক দ্বার উন্মোচন করেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। শ্রমিকদের সবেতন ছুটি উদযাপন, বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে ফ্যাসিবাদকে রুখে দিয়েছিলো। সেদিন সারা বিশ্বে ছিলো কমিউনিজমের জয় জয়কার। বারট্রান্ড রাসেল, রমা রঁল্যা, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ সকল মনীষী একে স্বাগত জানিয়েছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গানটি প্রথম বাংলায় লিখেছিলেন। কিন্তু এই বিরাট সভ্যতার পতন হলো কেনো? কারণ সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌছাবার মধ্যবর্তী স্তর। ক্ষুদ্র পুঁজিকে কেন্দ্র করে, মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যাসকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদে ফিরে আসার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। সোভিয়েতকে প্রতিনিয়ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। দেশের ভেতরে প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্ত মোকাবেলা করতে হয়েছে। একদিকে এই সকল বিরোধাত্মক পরিস্থিতি, অন্যদিকে চেতনার নিম্নমান, মার্কসবাদী রাজনীতি চর্চার ঘাটতি সোভিয়েতের পতন ঘটিয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব নেই। বিশ্বের অবস্থা এখন কী? ভারতে সরকার সরকারি দপ্তরের কাজ কন্ট্রাকটরকে দিয়ে দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা নামমাত্র মজুরিতে নিজের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। দরিদ্র কৃষক আত্মহত্যা করছে। দরিদ্র মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজের সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছে পরিবারগুলো কিছু টাকার বিনিময়ে। এদের বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। শুধু ভারত নয় - সব দেশেরই এক অবস্থা। এই সংকটের জন্ম দিয়েছে পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদ দেশে দেশে যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত দাঙ্গা প্রবল রূপ নিয়েছে। পুঁজিবাদ যে শত্রু এই চিন্তার বদলে তাদের মধ্যে বিপরীত ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়কে প্রধান শত্রু হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারতে বিজেপি-আরএসএসের মাধ্যমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভয়াবহ ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব এখন সারা বিশ্বে ঘটছে। ঘটাচ্ছে পুঁজিবাদ। ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি না বাঁচলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাঁচবে না। তাই যুদ্ধ তার চাই। একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এখন বিশ্বে দুটি অর্থনৈতিক-সামরিক জোটের। এর একটি হচ্ছে আমেরিকা-ভারত-অস্ট্রেলিয়া-জাপান-ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে; সেটাতে তারা নেপাল, বাংলাদেশসহ এই এলাকার অন্যান্য দেশসমূহকে যুক্ত করতে চায়। আর একটি হচ্ছে রাশিয়া ও চীনকে কেন্দ্র করে।

ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সব সময়েই আছে। বাংলাদেশে তিস্তার পানি তারা দিচ্ছে না, যত চুক্তি তারা স্বাক্ষর করছে তার প্রায় সবই অসম। সবই ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নেই, মানবজাতির মুক্তি নেই। কিন্তু পুঁজিবাদ এখন সমাজে মানুষ বলে কিছু রাখছে না। তাই এই সময়ে কমিউনিস্টদের কাজ খুবই কষ্টসাধ্য। এ সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে গণআন্দোলন গড়ে তোলা, ব্যাপক মানুষকে পুঁজিবাদের আগ্রাসন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও পুঁজিবাদবিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলন দেশে দেশে গড়ে তোলা - মানবসভ্যতাকে রক্ষার জন্য কমিউনিস্টদের যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রঃ
শ্রমদাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলো শ্রমিকদের

শ্রমজীবী মানুষের জীবনে অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে মে দিবস পালিত হলো। শ্রমিকের রক্তে রাঙ্গানো ঐতিহাসিক মে দিবসে একদিন পুঁজিবাদী শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিকের আত্মদানের চেতনায় ভাস্বর সাহসী সংগ্রাম রচিত হয়েছিল, আজও এরই প্রেরণায় দুনিয়ার দেশে দেশে শ্রমিক লড়াইয়ের বলিষ্ঠ হাত তোলে। ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণির জন্মের সাথে সাথে যে ব্যবস্থা তার বুকে শোষণের ভার চাপিয়ে দিয়েছিল বেঁচে থাকার জন্য লড়াই ছাড়া ভিন্ন আর কোন পথ খোলা ছিল না। ১৯১৭ সালের রক্ত ঝরানো পথ পেরিয়ে রাশিয়ার বুকে প্রথম শ্রমিক শ্রেণি পেয়েছিল শোষণমুক্তির আস্বাদ। পুঁজিপতি শ্রেণির সকল শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে দুনিয়ার প্রথম শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মে দিবসের যথার্থ চেতনা প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার পূর্ণতার রূপদানে এ রাষ্ট্র তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে ভূমিকা নিয়েছিল। তাই আজ মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষের পটভূমিতে মে দিবসের তাৎপর্য্য বোঝা প্রয়োজন।

বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় সর্বত্র শ্রমিকের কান্না। কাজ-না-পাওয়া, কাজ-হারানো আর কাজে-থাকা শ্রমিক কারও জীবনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। যাদের কাজ নেই তারা কাজের সন্ধানে পাগলের মত ছুটছে গ্রাম থেকে শহরে, এ শহর থেকে ও শহরে, দেশান্তরী হচ্ছে অজানা গন্তব্যে। পাড়ি দিচ্ছে বিপদসংকুল উত্তাল সমুদ্র আর গহীন জঙ্গল। প্রলোভন দেখিয়ে কখনো অসাধু চক্র কেড়ে নিচ্ছে সামান্য অবলম্বনটুকু পর্যন্ত। তাড়া খাওয়া বোধহীন জন্তুর মত যেন অবস্থা তার! আর যারা মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা যোগানোর যন্ত্রবিশেষ কর্মরত সেই শ্রমিককে প্রতি মূহুর্তে তাড়িয়ে বেড়ায় ছাঁটাই এর আতঙ্ক। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চলছে লে-অফ, লক-আউট, ছঁ-াটাই। শ্রমিকের বেতন, বকেয়া পাওনা পরিশোধে নানা তালবাহানা মালিকের। পেনসন, গ্র্যাচুইটি পেতে ভোগান্তির কোন শেষ থাকে না। আর বেকার শ্রমিকের নেই রাষ্ট্রীয় বেকার ভাতা। জাতীয় ন্যূনতম মজুরীর ব্যবস্থা নেই। কোন কোন সেক্টরে ন্যূনতম মজুরীর যে ব্যবস্থা আছে তাতে মানুষের মত বেঁচে থাকা চলে না। এটা দিতেও মালিকের কুণ্ঠা, ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়। শ্রম আইন মানার কোন বালাই নেই। শ্রম দপ্তরগুলো যেন একেকটা মালিকের নিরাপদ দূর্গ! মাথা খুঁড়লেও সেখানে শ্রমিকের প্রতিকারের উপায় থাকে না। শ্রমিকের স্থায়ী নিয়োগ নেই, নেই নিয়োগের স্থায়ীত্ব। স্বল্পমেয়াদী, কনট্রাকটরের অধীনে নিয়োগ, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ 'হায়ার এ্যন্ড ফায়ারে'র নীতি। চাকুরির নিরাপত্তা নেই। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সবচে' অ-নিরাপদ থাকে শ্রমিক। নেই কোন সামাজিক সুরক্ষা যেমন পেনসন, বীমা ইত্যাদি। নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র পাবার অধিকারের কথা তো দুস্কর। ফলে তাড়িয়ে দিলেও মালিক থাকে ধরা ছোয়ার বাইরে। পুরানো শিল্পাঞ্চলগুলোতে কবরের নীরবতা নামিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে আলো-ঝলমল-করা নতুন শিল্পাঞ্চল। প্রথমে কয়েক দশক ই পি জেড চালু করার পর এখন গড়ে তোলা হচ্ছে এস ই জেড বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন। কৃষি জমি ধ্বংস করে, বসত ভিটা উচ্ছেদ করে দেশী-বিদেশী মালিকদের মুনাফা লোটার নতুন মৃগয়া ক্ষেত্র। সেখানে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় প্রচলিত শ্রম আইন কাজ করে না। নেই সংগঠিত হবার অধিকার। যে কোন বাদ প্রতিবাদ টুঁটি চেপে ধরার জন্য শিল্প পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শ্রমিকের কাজের ন্যূনতম সময়সীমা নেই। অসংগঠিত ক্ষেত্রের তো হিসেব নেয়াই চলে না, সংগঠিত সেক্টরেও ১০/১২ ঘন্টা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বেশির ভাগ কারখানায় কাজের পরিবেশ চূড়ান্তভাবে অস্বাস্থ্যকর। নারী ও শিশুদের কম মজুরীতে খাটানোর এ এক অমানুষিক বর্বরতা। তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখবে কে? শ্রমিকের প্রাণের মূল্য মালিকের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। রানা প্লাজায় মর্মান্তিক ঘটনা এর জীবন্ত স্বাক্ষ্য দেয়। ফাটল ধরা কারখানার কাজে অনীহা জানালেও মালিক সে আপত্তি কানে তোলেনি। ভবন ধ্বসে প্রাণ হারিয়েছিল ১১৩৫ জন শ্রমিক। নিখোঁজ, আহত ও পঙ্গু হয়েছিল ততোধিক। মালিকের কোন বিচার হয়নি। আগুনে পুড়ে, বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক মৃত্যু সংবাদপত্রের প্রতিদিনের খবর। শ্রমিকের নেই পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমিকের এমন সরব মৃত্যু আর তিল তিল করে নীরব হত্যায় ঘটে চলছে পুঁজিবাদের তথাকথিত উন্নয়নের উৎসব! আর চাকচিক্য-ঝলসানো আলোর নীচে শ্রমিকের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার।

সমাজ বিকাশের ধারায় সামন্তী সমাজের অবসান ঘটিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লব হল। পুঁজিবাদের বিকাশের সেই কালে কল-কারখানা গড়ে উঠল। ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত খেটে খাওয়া মানুষ সেদিন কারখানায় কাজ নিল। সামন্তী শোষণের অবসান হলেও নতুন এ শ্রমিক শ্রেণির উপর নতুন ধরনের শোষণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মালিকের লাভের ব্যবস্থা করার জন্য শুরু থেকেই শ্রমিকের থেকে যত সম্ভব খাটুনি আদায় করা হত। নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা বলে কিছু ছিল না। ১২ থেকে ১৬ ঘন্টা শ্রম করা ছিল বাধ্যতামূলক। উনিশ শতক জুড়ে চলা এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ১৮৬৬ সালে প্রথম আমেরিকায় শ্রমিক ইউনিয়ন ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবী তোলে। কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম আন্তজার্তিক এ দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। তীব্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৮৬৬ সালের ১ মে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। শিকাগো শহরে এ ধর্মঘট ব্যাপকভাবে পালিত হয়। ৩ মে মার্কিন সরকারের পুলিশ বাহিনী শ্রমিকদের উপর হামলা চালায়। প্রতিবাদে পরদিন ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটের সভায় নৃশংস হামলায় শ্রমিক প্রাণ হারায়। ব্যাপক ধরপাকড় করা হয়। এমনকি প্রবল জনমত উপেক্ষা করে শ্রমিক নেতা পার্সন, ফিসার, স্পাইজ,এঙ্গেলকে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু তাতেও আন্দোলন দমানো যায়নি। এর ৩ বছর পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা মহামতি এঙ্গেলসের আহ্বানে সারা দুনিয়ায় মে দিবস হয়ে উঠে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। এক সময় অন্দোলনের চাপে এ মে দিবস যেমন স্বীকৃতি পায় তেমনি ৮ ঘন্টা শ্রম দিবস মেনে নিতে বাধ্য হয় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ। এ আন্দোলনের ধারায় দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণি আরও বহু অধিকার অর্জন করে।

সর্বহারার মহান নেতা লেনিন ও তার সুযোগ্য উত্তরসূরী স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সঠিক আদর্শ ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র। মালিকী শোষণের অবসান হয়। এ ঘটনা শ্রমিকদের শুধু অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথে এগিয়ে নেয়নি, প্রভূত রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার ও উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের সন্ধান দেয়। সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কাজের অধিকার, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, চাকুরির নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা যেমন- পেনসন, সামাজিক বীমা, ন্যূনতম মজুরী, কাজের ঘন্টা হ্রাস, মাতৃত্বকালীন দীর্ঘমেয়াদী ছুটির অধিকারসহ বিনোদন-বিশ্রামের সব রকম অধিকার নিশ্চিত করেছিল। এটা ১৯৩৬ সালে দুনিয়ার সবচে প্রগতিশীল সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত সংবিধানে আইনীভাবে গৃহিত হয়েছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মাত্র ১৩ বৎসর পরে তারা এটা সম্ভব করতে পেরেছিল। বেকারত্ব কী উন্নত কী অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সমাজের একটা দুষ্ট ক্ষত হিসেবে যা ক্রমাগত বেড়ে চলছিল কীসের জোরে তার উচ্ছেদই শুধু করেনি বরং কাজের প্রয়োজনে রাশিয়ায় শ্রমিক পাওয়া ও অনেক সময় দুরূহ হয়ে উঠেছিল? এটা সম্ভব হয়েছিল এমন একটা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যেখানে শোষণ চলে না, ভাড়ায় খাটানো শ্রমিক বলে কারও অস্তিত্ব থাকে না। সবাই সমাজের জন্য শ্রমদানে স্বেচ্ছাসেবী আত্মত্যাগী মনোভাব লালন করে যে শ্রম ক্রিয়াকলাপের পরিস্থিতি তৈরী করে তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এটা ঘটে। এটা সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির এক ঐক্যবদ্ধ বিশাল বাহিনীর যথার্থ শ্রেণি চেতনার শক্তির জোরে ঘটতে পেরেছে। পরবর্তীতে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদীরা রাষ্ট্র ও পার্টির নেতৃত্ব দখল করে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটায়। ফলে একদিকে যেমন তারা সমস্ত অর্জিত অধিকার হারায় এবং পুঁজিবাদী করাল গ্রাস সমাজ জীবনে আবারো অধঃপতন ডেকে আনে। এ অভিজ্ঞতা রাশিয়ার শ্রমিকের মত দুনিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ মহান নভেম্বর বিপ্লবে যে পথ আঁকা হয়েছিল, যে পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা বহন করে। এ পথেই আজ শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিপথের সন্ধান মিলবে। এ পথেই এ দেশেরও ভবিষ্যত- মে দিবস বারে বারে আজ সে কথা বলে যায়।

সরকারের ছত্রছায়ায় চালের দাম বাড়াচ্ছে চালকল মালিক-মজুতদার-ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট

(৭ম পৃষ্ঠার পর) মজুত এখন ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন, আড়াই লাখ টনের কিছু বেশি। কিন্তু গত বছর এই সময় মজুতের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৩০ হাজার টন। সরকারি গুদামে চালের মজুদ এমন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছায় চালকল মালিকরা বুঝতে পেরেছেন, সরকার সহসা ওএমএসসহ অন্য ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু করে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এ পরিস্থিতি চালকল মালিকদের খেয়ালখুশিমতো চালের দাম বাড়াতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী এড. কামরুল ইসলাম জানিয়েছেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কারসাজির জন্য চালের দাম বেড়েছে। আমরা বাজার পর্যবেক্ষণ করছি। দেশে ধান-চালের কোনো সংকট নেই। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, হাওরে অকাল বন্যায় ও ব্লাস্ট রোগে এবার ১৫ লাখ টন ধান নষ্ট হয়েছে, যা চালের হিসেবে ১০ থেকে ১২ লাখ টন। তবে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকে। এছাড়া বর্তমানে সরকারের গুদামে সাড়ে ৫ লাখ টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। তাই দেশে বছরে প্রায় ৩ কোটি টন চালের চাহিদা মেটাতে কোনো সমস্যা হবে না। অথচ, বাজার 'পর্যবেক্ষণ' করে সরকার এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি। 'অসাধু' ব্যবসায়ী যারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কারসাজি করছে তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ধানের এ ভরা মওসুমে চালের দাম বাড়ার কথা নয়। অথচ বাড়ছে এবং তা নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কৃষক থেকে মিলার-ব্যবসায়ী ও সেখান থেকে প্রান্তিক ক্রেতা পর্যন্ত চাল আসার যে চেইন, তাতে কোনো সমস্যা হলে বাজারে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এখন বাজারে যেসব চাল বিক্রি হচ্ছে তার বেশির ভাগ হলো মজুতদার, মধ্যস্বত্বভোগী বড় বড় মিলার ও পাইকারি ব্যবসায়ীর। মিলার ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে অতি মুনাফা শিকারের প্রবণতা বরাবরই লক্ষ্য করা যায়। দেশে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মিল মালিক ও ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। বোরো ও আমন মৌসুমে কৃষকের কাছ থেকে কম দামে চাল কিনে গুদামজাত করেন তারা। বাজারে সংকট সৃষ্টি করে বাজার অস্থির করে তোলেন। সংকটকে পুঁজি করে তারাই দাম বাড়ায়।

চাল বা খাদ্যশস্যের বাজারের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বাজার ব্যবস্থাপনা বলতে যা বুঝায়, তারও কোন বালাই নেই। চালের দাম বাড়লে, কেন বাড়ছে তা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খোঁজ-খবর করে না। সেই অতি পুরনো পন্থা অনুসরণ করে স্বল্পমূল্যে খোলাবাজারের চাল বিক্রির ব্যবস্থা নেয়। এই কার্যক্রম হয়তো কিছুদিন থাকে, তাও গ্রামে-গঞ্জে নয়, শহরাঞ্চলে; তারপর এই কর্মসূচি এক সময় হাওয়া হয়ে যায়। সরকারের তরফে সব সময় বড়-গলা করে বলা হয়, দেশে খাদ্যশস্যের কোনো সঙ্কট নেই, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সত্য বটে, দেশে ধান-চালের অভাব নেই। প্রয়োজনে আমদানির ব্যবস্থাও আছে এবং আমদানিও হয়ে থাকে। তারপরও চালের বাজারে অস্থিরতা-অস্থিতিশীলতা কেন তার কোনো জবাব খুঁজে দেখা হয় না। অসৎ মিলার-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। খুচরা, পাইকারি ও মিলারদের একে অপরকে দায়ী করে গা বাঁচানোর চেষ্টা করে। মাঝখান থেকে ক্রেতা-ভোক্তার পকেট কাটা যায়। তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার কেউ নেই।

মজুতদারদের কারসাজির বিষয়ে কোন নজরদারি না থাকায় চালের দাম বাড়ছে। পাশপাশি বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ ও অংশগ্রহণ দরকার। খাদ্য বিভাগের খোলা বাজারে চাল বিক্রি কার্যক্রম নিয়মিত চালু রাখতে হবে। বাংলাদেশ কৃষিতে ভর্তুকি কম দেয়। তাই এ দেশে চালের উৎপাদন খরচ একটু বেশি। ধানের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষি খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, ধানচাষীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ, সার সহজলভ্যকরণ, সেচ সুবিধা বাড়ানো ইত্যাদি কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। চলতি অর্থবছরে (২০১৬-২০১৭) চাল আমদানির ওপর শুল্কের হার ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করায় বেসরকারি খাতে চাল আমদানি ভীষণভাবে কমে গেছে। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে এখন চাল আমদানি করতে হবে। বেসরকারি আমদানিকারকদের সুবিধার্থে চালের আমদানি শুল্ক সাময়িকভাবে কমানোও যেতে পারে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ ধারা বাতিলের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

সরকার জনগণের মতকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী কায়দায় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান প্রযোজ্য রেখে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' শীর্ষক বিলটি সংসদে পাশ করেছে। যে দেশে আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বিবেচনা করা হয়, সে দেশে ১৮ বছরের নিচে বিয়ের বিধান রাখা মানেই শিশু বিবাহকে বৈধতা দেয়ার সামিল বলে আমরা মনে করি। সমাজের বিশেষ বাস্তবতা মোকাবিলা করতে না পেরে সরকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা ও নারীর অধস্তন অবস্থা বহাল রাখার লক্ষে ভোটের রাজনীতিকে সামনে রেখে মৌলবাদী দল ও গোষ্ঠীকে নিজেদের কাছে রাখার জন্যই এই আইন প্রণয়ন করেছে। সরকার একদিকে উন্নয়ন, ডিজিটালাইজেশনের শ্লোগান দিচ্ছে, আর অন্যদিকে নারীদের পশ্চাৎপদ সামাজিক অবস্থানকে পরিবর্তনের উদ্যোগ না নিয়ে আরো পশ্চাতে ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র এই আইন বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী স্বাক্ষরসংগ্রহ করেছে। ১৬ মে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে ২১ মে সকাল সাড়ে ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে "বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭" এর বিশেষ ধারা ১৯ বাতিলের দাবিতে সমাবেশ করেছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনিদীপা ভট্টাচার্য, ঢাকা নগর শাখার দপ্তর সম্পাদক ইভা মজুমদার, সদস্য সুস্মিতা রায় সুপ্তি। সমাবেশ শেষে সভাপতি সীমা দত্তের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

ইউজিসি'র ২০বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাতিলের দাবিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে উচ্চশিক্ষায় ৫গুণ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবনা বাতিল, শিক্ষা গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, পিপিপি-হেক্যাপ প্রকল্প বাতিল, ডাকসুসহ সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংসদ নির্বাচন ও ইউজিসির ২০বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাতিলের দাবিতে ১৮ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় কনভেনশন উদ্বোধন করেন তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টুর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুজ্জামান সাকন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। উদ্বোধনের পর বেলা ১২ টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল অপরাজেয় বাংলা থেকে শুরু করে বাণিজ্য অনুষদ, মধুর ক্যান্টিন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, টিএসসি, কাজী মোতাহার হোসেন ভবন, কার্জন হল হয়ে জিমনেসিয়াম মাঠে এসে শেষ হয়। এরপর বেলা ৩টায় টিএসসি অডিটোরিয়ামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন দৈনিক নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর, স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা জহিরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দিন খান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা, সাপ্তাহিক 'সাপ্তাহিক' পত্রিকার সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। সবশেষে কনভেনশনের ঘোষণা পত্র পাঠ করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা।

মহান বিজ্ঞানী ডক্টর জামাল নজরুল ইসলাম স্মরণ

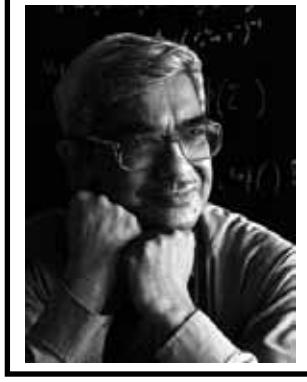

জামাল নজরুল ইসলাম বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি বিদেশের বিলাসবহুল জীবন এবং কর্মক্ষেত্রের অপার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছেড়ে মাতৃভূমির টানে দেশে ফিরে আসেন। জামাল নজরুল ইসলামের যথার্থ মূল্যায়ন তখনই হবে যখন জাতি হিসেবে আমরা বিজ্ঞান মনস্ক ও দেশ প্রেমিক হয়ে গড়ে উঠবো। শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়েই নয়, তাঁর জীবন ও সংগ্রামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে নিজেদের জীবনে। এই অঙ্গিকার নিয়ে বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র চবি শাখা এই মহান বিজ্ঞানীকে স্মরণ করেছে আলোচনা সভা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে।

চবি শাখার সমন্বয়ক ফজলে রাব্বির সভাপতিত্বে ও রিটু রায়ের সঞ্চালনায় গত ২০মার্চ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী মিলনায়তন অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জামাল নজরুল ইসলাম ভৌত বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র চবির পরিচালক প্রফেসর ড. অঞ্জন কুমার চৌধুরী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এস্ট্রোনমিকাল এ্যাসোসিয়েশনের মডারেটর ড. শরিফ মাহমুদ ছিদ্দিকী।

দুরন্ত শৈশব ও প্রাণবন্ত কৈশোরের আবাহনে শিশু কিশোর মেলার সদস্য সম্মেলন

এখন শিশুরা আনন্দ করার সময়টুকুও পায় না, স্কুল ও কোচিং এর চাপ এবং সৃজনশীল পদ্ধতির চাপে শিশুরা শৈশবের আনন্দটুকু পায় না। এখনকার শিক্ষকরা তাদের মর্যাদা পায় না কারণ সমাজে তারা আর্থিক দৈন্য দশার মধ্যে দিনাতিপাত করে। সমাজে ধনী গরীবের বৈষম্য পাকাপোক্ত করতে তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে মাদ্রাসার শিক্ষার প্রভাব লক্ষণীয়। এত সব সমস্যার মূল কারণ নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে তা আজ সকলকে বুঝতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকৃত মানুষ তৈরী করা কিন্তু পুঁজিবাদ শুধু নিজের কারণে মানুষকে শিক্ষিত করে। সেই শিক্ষা একজন থেকে আরেকজনকে বিচ্ছিন্ন করে। বর্তমান শিক্ষা আমাদের বালুর মত আলাদা করছে, ঢেউয়ের মত একত্রিত করতে পারছে না। আমরা বালুর মত বিচ্ছিন্ন হব না, ঢেউয়ের মত একত্রিত হব। আন্দোলন ছাড়া এসকল সমস্যা থেকে উত্তোরণের আর অন্য কোন পথ নেই। শিশু কিশোর মেলার সদস্য সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

গত ২৯ মার্চ ২০১৭, সকাল ১০ টায় শিশু কিশোর মেলার জাতীয় পর্যায়ে প্রথম সদস্য সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সকাল ১১ টায় শিশু কিশোরদের নিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে বিজ্ঞান, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ, চারুকলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, ইতিহাস, সাহিত্য ও লিখন শৈলী, নাট্যকলা, বিতর্ক এবং অভিভাবকদের ছেলে-মেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে মোট ১০ টি বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন হয়। সারা দেশ থেকে ৮০ টির অধিক স্কুল থেকে শিক্ষার্থীরা এসকল কর্মশালায় অংশ নেয়। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান প্রজেক্ট ও দেয়ালিকাসহ এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। সবশেষে সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশিত হয়।

রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ

দেশে গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উপড়ে ফেলে একটা মানবিক সমাজ গড়তে হলে আমাদের মহান চরিত্রগুলোর কাছে যেতে হবে। আমাদের দেশের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিন মহান ব্যক্তিত্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যাঁরা শুধু সাহিত্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি সমাজের প্রতিটি অন্যায়, অবিচার, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। যখনি সমাজে কোন সংকট উপস্থিত হয়েছে তখনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত তাঁদের সাহিত্য, কাব্য, গানের মাধ্যমে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার নামে সমাজের ও দেশের সংকট এড়িয়ে চলেননি। এ কারণেই বৃটিশদের দেওয়া নাইট উপাধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্যাগ করেন। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিষবাষ্প দেখে লেখেন সভ্যতার সংকট। নজরুল বিদ্রোহের রণঝাণ্ডা নিয়ে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, কারাবরণ করেছেন। সুকান্ত চূড়ান্ত অসাম্যের সমাজকে চূর্ণ করতে যৌবনকে জাগিয়েছেন।

এই মনীষীদের স্মরণে গত ১৯ মে নন্দনকাননস্থ ফুলকিতে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার আয়োজনে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চারণ সংগঠক শাহীন মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর ইনচার্জ ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য সোমা, ওয়েলস থেকে আগত শিক্ষক ও সমাজকর্মী উইলিয়াম, চারণ সংগঠক মেজবাহ্ উদ্দিন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর শিল্পীরা। 'বিসর্জন' নাটকের অংশ বিশেষ পাঠ করেন নাট্যকার তাপস চক্রবর্ত্তী।

ভারত-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফরে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের সরকারি তৎপরতার প্রতিবাদে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ১ এপ্রিল বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলের কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম, মানস নন্দী, ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "প্রস্তাবিত নিরাপত্তা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের অস্ত্রবাণিজ্য এবং ভূ-রাজনৈতিক-সামরিক পরিকল্পনার সাথে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। এদেশের সাধারণ মানুষের কোন স্বার্থ এতে নেই, ভারতের স্বার্থে তাদের প্রস্তাবে এ চুক্তি হতে যাচ্ছে। অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার স্বার্থে দেশের জন্য দীর্ঘস্থায়ী বিপদ ডেকে আনছে।"

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র নয়, অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা চায়। তিস্তার পানিবন্টনে কোন অগ্রগতি নেই, পদ্মায় ধূ-ধূ বালুচর, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি সরিয়ে নেয়ার ফলে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। বাংলাদেশের মানুষের এ জীবন-মরণ সমস্যায় ভারত কোন ছাড় দিচ্ছে না। অথচ, মহাজোট সরকার ভারতের সমর্থন পেতে স্বল্প শুল্কে ট্রানজিট, নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ নানা একতরফা সুবিধা তাদের দিয়ে চলেছে।" নেতৃবৃন্দ এধরনের জনস্বার্থবিরোধী চুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। তাঁরা সরকারের এই পাঁয়তারার বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার থাকার আহবান জানান।

'শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব: বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্টদের কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাসদ(মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে 'শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব: বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্টদের কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনা সভা গত ১০ এপ্রিল' ১৭ বিকেল ৪টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার (কমিউনিস্ট)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

সভাপতির বক্তব্যে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ পালন করছি আমরা এমন এক সময়ে যখন প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে গেছেন। কিন্তু তিনি কিছুই আদায় করতে পারেননি। নিরাপত্তা সহযোগিতা-অস্ত্র ক্রয়-লাইন অব ক্রেডিট ঋণ-পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়ন-ডিজেল ও বিদ্যুৎ আমদানি-কানেকটিভিটি বৃদ্ধি-মহাকাশ সহযোগিতা-সাইবার নিরাপত্তাসহ প্রায় সব সমঝোতার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর ভারতের সামরিক, বাণিজ্যিক ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বাড়বে। পক্ষান্তরে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা, অববাহিকাভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনা, গঙ্গা ব্যারেজসহ বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আশ্বাস ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর সমর্থন নিশ্চিত করতে নতজানু নীতি অনুসরণ করে চলেছে। সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের শাসকদের বন্ধুত্বে জনগণের কোন স্বার্থ নেই – তা আরেকবার প্রমাণিত হল। আজকের এ আলোচনা সভায় ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এর সাধারণ সম্পাদক এসেছেন। আমরা যেমন ভারতকে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ মনে করি, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)ও তেমনি তাকে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলে মনে করে। তারাও দক্ষিণ এশিয়া, মিয়ানমার, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশে ভারতের *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

লুটপাট বন্ধ ও সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

কৃষকরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সন্তানসম যত্নে ফসল ফলায়, গোটা দেশের মানুষের মুখের খাবার যোগায়। সেই কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য না পায় না। ফসল ভাল হলে সরকার বাম্পার ফলনের কৃতিত্ব দাবি করে কিন্তু কৃষকের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়ায় না। এবারে উত্তরাঞ্চলে হাজার হাজার বিঘা জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই রোগ নির্মূলে সরকার কার্যকরী কোন উদ্যোগ নেয়নি। বিএসরা কোন কৃষকের জমিতে যায়নি, করণীয় সম্পর্কে কোন পরামর্শ দেয়নি। এসব নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কোন মনিটরিং নেই। ক্ষতিগ্রস্থ ও ক্ষুব্ধ কৃষকদের সাথে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখা নেক ব্লাস্ট রোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষতিপূরণ, কৃষক ও ক্ষেমজুরদের জন্য আর্মি রেটে রেশন প্রদানের দাবিতে গত ১৫মে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও ও ডিসির মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে। সংগঠনের জেলা আহবায়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষক ফ্রন্টের জেলা সংগঠক আহসানুল আরেফিন তিতু, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক দুলাল হোসেন, আতাউর রহমান, নজরুল ইসলাম, তপন চন্দ্র রায় প্রমুখ।

এদিকে সরকারি উদ্যোগে ধান ক্রয়ের টাকা লুটপাট বন্ধ, হাটে হাটে ক্রয় কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়, কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ২২ মে গাইবান্ধা শহরেও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এবং বাসদ(মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা শাখা এই কর্মসূচীর আয়োজন করে। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে শহরের ১নং রেলগেটে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মাকর্সবাদী) জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য সচিব মঞ্জুর আলম মিঠু, কৃষক ফ্রন্ট সদর উপজেলা সভাপতি প্রভাষক গোলাম সাদেক লেবু, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবর রহমান, বজলুর রহমান প্রমুখ।

১৬০০০ টাকা নিম্নতম মোট মজুরী, ও কর্মস্থলে নিরাপত্তার দাবিতে মহান মে দিবস পালিত

মহান মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী) ও বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ১ মে সকাল ১০টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এক মিছিল বের হয়ে পল্টন, প্রেসক্লাব হয়ে আবার সংগঠন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন নেতা ডা. মুজিবুল হক আরজু প্রমুখ। একই দিন দেশের বিভিন্ন জেলায় ফেডারেশনের উদ্যোগে মে দিবস পালিত হয়।

রমেল,ইতি ও ছাদিকুল হত্যার ন্যায় বিচারের দাবীতে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল

রমেল চাকমা, ইতি চাকমা ও মোটর সাইকেল চালক ছাদিকুল হত্যার বিচারের দাবীতে গত ৭ মে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং কি সারা দেশে সামরিক বাহিনী, দুর্বত্তদের হাতে একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চলছে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছে। যারা দেশের রক্ষক তারাই মানুষ মারার হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হচ্ছে। তনু, রমেল হত্যা তারই প্রমাণ। পেটের দায়ে মোটর সাইকেল ভাড়ায় চালাতো ছাদিকুল। দুর্বৃত্তদের হাতে তাকেও প্রাণ হারাতে হল। খাগড়াছড়ি কলেজের শিক্ষার্থী ইতি চাকমা হত্যাকান্ডের বেশ কয়েক মাস হলেও অপরাধী এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইতি চাকমা নিজবাড়িতেই খুন হন দুর্বৃত্তের হাতে। এভাবে একের পর এক হত্যাকান্ড চলছে এবং অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। বক্তারা সমাবেশ থেকে এইসব হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের শাস্তি এবং জনগণের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবী জানান। সমাবেশে ছাত্র ফ্রন্ট শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম কৃষ্ণ দে'র পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন শহর শাখার আহ্বায়ক কবির হোসেন, সদস্য স্বাগতম চাকমা।

দুর্গত হাওড়বাসীর দুর্গতির শেষ কোথায়?

(১ম পৃষ্ঠার পর) ভাবেননি নিজে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের মুখে খাবার দিতে পারবেন না। ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না তারই মতো শত সহস্র পিতা। হয়তো হাওরের পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। ঘরে তো ফিরবেন, কিন্তু কিভাবে ফিরবেন? কি আশা নিয়ে?

হাওরের মানুষ বর্ষায় ঘরের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়। কারণ তখন ফসল বিক্রির টাকাটা হাতে থাকে। সিলেট ও ময়মনসিংহের হাসপাতালগুলোতে রোগীর ঢল নামে। কারণ সবাই তাদের সকল রোগ নিয়ে এই সময়টার জন্যই বসে থাকেন চিকিৎসা করবেন বলে। আজ সব শেষ। হাওরের বাতাসে বাতাসে আজ 'সব শেষ' এর সুর বাজছে।

কৃষক ফসল তুললেও মরে, ডুবলেও মরে

গত দুই দশকে প্রতি তিন বছরেও একবার পুরো ফসল ঘরে তুলতে পারেনি হাওরের কৃষকরা। এই সময়ের মধ্যে ২০০৮ সালেই বেশির ভাগ ফসল কৃষকের ঘরে উঠেছে। প্রতি বছরই পাহাড়ি ঢলে কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে, কোথাও বাঁধ উপচে পানি ঢুকেছে। গত বছরও ৬০ শতাংশের মতো ফসল নষ্ট হয়েছে। ২০১৫ সালে নষ্ট হয়েছে ৪০ শতাংশের মতো (সূত্র- কালের কণ্ঠ ২৭ এপ্রিল ২০১৭)। এই ফসল নষ্ট হওয়া বছর বছর লেগেই আছে। কিন্তু যতটুকু ফসল কৃষক তুলতে পারে তার কি অবস্থা? ফসলের ন্যায্য মূল্য সে পায় তো?

কৃষি অধিদপ্তরের মতে বর্তমানে প্রতি কেজি ধানের উৎপাদন খরচ ২১ টাকা। সরকার প্রতি কেজি ধান ক্রয় করে ২৩ টাকায়। কিন্তু কৃষক সরাসরি সরকারের কাছে ধান বিক্রয় করতে পারে না। তারা বিক্রয় করে আড়তদারের কাছে। আড়তদারের কাছ থেকে কৃষক প্রতি কেজি ধান বিক্রি করে পায় ১২ থেকে ১৫ টাকা। অর্থাৎ কেজিপ্রতি কৃষকের লোকসান ৬ টাকা। প্রতি মণে কৃষকের লোকসান হয় ২৪০ টাকা। অথচ আড়তদাররা মণপ্রতি লাভ করে ৩২০ টাকা। এতবড় ঝুঁকি নিয়ে বীজ-তলা তৈরি করা থেকে ধানকাটা পর্যন্ত অপরিসীম কষ্ট করে কৃষক লোক-সান গুণে মণপ্রতি ২৪০ টাকা। আর কোন কিছু না করেই আড়তদাররা লাভ করে মণপ্রতি ৩২০ টাকা। এ হলো প্রতি বছরের চিত্র। বাম্পার ফলন হলে টিভিতে প্রধানমন্ত্রী 'ভি' চিহ্ন দেখান কিন্তু সারাদেশের কৃষকের মুখ রক্তশূন্য হয়ে নীল হয়ে যায়। কারণ তখন ফসলের দাম আরও কমে। এ হলো ফসল ঠিকমতো ঘরে উঠলেও কৃষকের যে অবস্থা হয় তার চিত্র। আর এরকম অকালবন্যায় যখন সব ফসল ভাসিয়ে নিয়ে কৃষকদের রাস্তায় বসিয়ে দেয়, তখন তার অবস্থা কি হয় বলাই বাহুল্য।

ফসল ডুবেছে অকালবন্যায়, সরকারের কি কোন দায় ছিলো?

এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। সুনামগঞ্জের হাওরগুলি হলো এদেশের প্রধান নিম্নাঞ্চল এলাকা। লুসাই পাহাড় থেকে বরাক নদীর উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের মুখে সে সিলেটের আমলশীদের কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা এ দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। এই দুই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এ হাওরগুলো। হাওরবেষ্টিত জেলা বাংলাদেশে ৭টি- সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এই সাতটির মধ্যে সুনামগঞ্জ ছাড়া অন্যসব জেলার হাওরগুলোর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৪ মিটার। কিন্তু সুনামগঞ্জের হাওরগুলোর উচ্চতা ২ মিটার। একারণে মেঘালয় বা বরাক উপত্যকার যে কোন বৃষ্টিপাতের পানি সবার আগে সুনামগঞ্জের হাওরের দিকে ধাবিত হয়। ওই এলাকার নিম্নাঞ্চলকে পূর্ণ করার পরই সে সাগরের দিকে যায়। এটি একটি দিক।

আরেকটি দিক হলো বাংলাদেশ ভূখণ্ডে গড় বৃষ্টিপাতের হার বছরে ২৩০০ মিমি। কিন্তু সিলেটে এই হার ৪০০০ মিমি আর সুনামগঞ্জে ৫০০০ মিমি'র ও বেশি। ভারি বৃষ্টিপাতের কারণেও এই এলাকাটি অত্যধিক মাত্রায় বন্যাপ্রবণ।

বছরে দুটো সময় (বর্ষা ও শরৎকালে) বন্যা আমাদের এখানে সাধারণ ব্যাপার। এজন্য আমাদের কোন ক্ষতি হয় না বরং আমরা এর মাধ্যমে প্রচুর পানিসম্পদ পাই। আমাদের নদী-নালা-পুকুর-বিল-জলাশয়গুলো এ সময় ভরে উঠে। কিন্তু অকালবন্যা আমাদের জন্য বিরাট দুর্ভোগ ডেকে আনে, যেমন এবারে চৈত্রের শেষের দিকের বন্যা আমাদের বিরাট ক্ষতি করে দিয়ে গেলো।

এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেয়া হয় হাওরজুড়ে। প্রতি বছরই এজন্য বরাদ্দ আসে। এবছরও বাঁধ নির্মাণের জন্য ৬৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এসেছে। ঘটনা যা ঘটে তা হলো, বন্যা যেহেতু সব বছর হয় না সেক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণ না করে কাটিয়ে দিতে পারলে এবং বন্যা না হলে এই টাকার পুরোটাই পকেটস্থ করা যায়। টাকার অঙ্কটাও কম নয়। সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাঁধ নির্মাণ শেষ করার কথা। সেটা যেহেতু করা হয় না, না করে চালিয়ে দেয়া যায় কিনা সেজন্য অপেক্ষা করা হয়, তারপর বৃষ্টি পড়লে, জোর হাওয়া দিলে তড়িঘড়ি করে বাঁধ নির্মাণ করা হয়- সেকারণে এই বাঁধ স্রোতের সামান্য ধাক্কায়ও আর টেকে না। এ বাঁধগুলো মাটি দিয়ে তৈরি। এমনিতেই বড় কোন স্রোত মোকাবেলা করার সামর্থ্য তার নেই। তার উপর ঠিক সময়ে দিলে তা যতটুকু শক্ত হতে পারতো, অন্তিম মূহুর্তে একেবারে তড়িঘড়ি করে দেয়ার কারণে সে কাঁচা মাটির বাঁধ হয়েই থাকে। কোন প্রবল স্রোত মোকাবেলার সামর্থ্য সে রাখে না। বাঁধ দেয়ার ক্ষেত্রে এই গাফিলতির জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উভয়েই দায়ী। কারণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি করা হয়, তাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রি-তিনিধি উভয়েই থাকেন। এই তহবিলকে লুটপাট করার ঘটনা উভয়ের হস্তক্ষেপেই ঘটে।

ফসল নষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ ফসলের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন

পূর্বে এই হাওর এলাকায় স্থানীয় বোরো ফসলের চাষ হতো। এটি ১২০ দিনেই মাঠ থেকে তুলে নেয়া যেতো। ফলে চৈত্রের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এই ধান গোলায় উঠে যেতো। কিন্তু এখন উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চাষ হয়। এতে একরপ্রতি ফলন আগের থেকে প্রায় তিনগুণ বাড়লেও বীজতলা থেকে ধানপাকা পর্যন্ত সময় লাগে প্রায় ১৪০ থেকে ১৫০ দিন। ফলে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত লেগে যায় এই ধান তুলতে। এই কারণে এই ধান অকালবন্যা থেকে শুরু করে কালবোশেখির থাবা সকল কিছুর জন্যই সংবেদনশীল।

গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের অবস্থা খুবই করুণ

দুই ধরনের প্রথায় হাওর অঞ্চলে ধান চাষ হয়। ৫০/৬০ বিঘা জমির মালিক অনেকেই আর নিজে কৃষিকাজ করেন না। বেশিরভাগই শহরে থাকেন। জমিগুলো হয় বর্গা দেন অথবা চুক্তিতে (স্থানীয় ভাষায় বলে 'রঙজমা') দেন। বর্গার নিয়ম হলো যে কৃষক চাষের জন্য তার জমি নেবে সে তাকে ফসলের অর্ধেক দেবে। আর চুক্তিতে তিনি কিছু টাকার বিনিময়ে কৃষককে জমিটা এক বছরের জন্য দেবেন। সেখান থেকে সে যা উৎপাদন করতে পারবে সেটা তার। লোকসান হলেও তার হবে। এই চুক্তির জমি যারা নিয়েছেন (নিজের প্রচুর চাষের জমি নেই বলেই নিয়েছেন), তারা সবদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। বিরাট সংখ্যক ক্ষেতমজুর যারা এইসব লোকের অধীনে মজুরির বিনিময়ে ধান তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন এই সময় তারা পুরোপুরি বেকার হয়ে বসে আছেন। আর বর্গাতে যারা জমি নিয়েছেন তারা ফসল তো পেলেনই না, উপরন্তু চাষের জন্য যে খরচ করলেন তার পুরোটাই ঋণ হিসেবে ঘাড়ে চেপে বসেছে।

যারা ৫০/৬০ বিঘার মতো জমির মালিক, নিজেরা হয়তো চাষ করেন না, হয় বর্গা না হয় চুক্তিতে জমিগুলো দিয়ে দেন তাদের পরিস্থিতিও খারাপ। এরা অনেকেই শহরে বাস করেন। কেউ চাকরি করেন, কেউবা ছোট ব্যবসা করেন। গ্রামের জমি থেকে আসা চাল দিয়ে হয়তো তাদের সারা বছরের খোরাক হয়ে যায়। অথবা এখান থেকে আসা কিছু টাকা থেকে পরিবারের বয়স্কদের চিকিৎসা বা অন্য প্রয়োজন মেটানো হয়। এরা কেউই খুব সম্পদশালী ব্যক্তি নন। লেখাপড়া করে চাকুরি নিয়ে কিংবা ছোটখাট ব্যবসা করে শহরে একটা মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করেন। এই টাকা কিংবা চাল তার জন্য খুব প্রয়োজনীয়ও। তাদেরকেও একটি বড় রকমের দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিলো এই দুর্যোগ।

এটি কি দুর্গত এলাকা?

সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারদলীয় রাজনীতিবিদদের হাসির খোরাক জোগানো বক্তব্য বাংলাদেশে কোন নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু এরকম একটা দুর্যোগে হাস্যকর কথা বলা হয় কোন রকম বুদ্ধিবৃত্তিক বৈকল্য কিংবা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নিস্পৃহতাকে নির্দেশ করে। এক কর্মকর্তা বলেছেন, ৫০ ভাগ লোক মারা না গেলে নাকি দুর্গত এলাকা ঘোষণা করা যায় না। আরেকজন বললেন, একটা ছাগলও মরলো না তাহলে এটা কিসের দুর্গত এলাকা। এধরনের মন্তব্য খুবই দুঃখজনক। একটি ঘটনা একটি এলাকার মানুষের জনজীবনে কি কি পরিবর্তন এনেছে ও ভবিষ্যতে আনবে তা হিসেব করেই সে দুর্গত কিনা এই মূল্যায়নটি করতে হয়। এ প্রসঙ্গে কিছু বিষয় মাথায় রাখা দরকার।

প্রথমত, হাওর অঞ্চলের জমিগুলো একফসলি। বছরে একবারই চাষ হয়। বাকি সময় পানির নিচে থাকে বলে সেখানে অন্য কোন শাক-সব্জীরও চাষ হয় না। অন্যান্য জায়গায় যেমন বন্যার পানি নেমে গেলে পলি পড়া জমি উর্বর হয়, ভাল ফসল ফলে, হাওরের জমির ক্ষেত্রে তা ঘটে না। তাদের ফসল একবার ভেসে গেলে তাদের টিকে থাকার আর কোন পথ থাকে না।

দ্বিতীয়ত, হাওর অঞ্চলের মানুষের কৃষিজমি বাদে আরেকটি আর্থিক উৎস হলো মাছ। কিন্তু বিল থেকে, ছোট ছোট জলা থেকে মাছ আহরণ করার কোন রাস্তা এখন খোলা নেই। আগে এ অঞ্চলের লোকেরা যেখানে ইচ্ছা মাছ ধরতে পারতো। এখন আর তা সম্ভব নয়। কারণ এখন হাওরগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে এবং বিলগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে ইজারা দেয়া হয়। এই ইজারাদাররা খুবই প্রভাবশালী লোক। এরা জলাগুলোতে সশস্ত্র পাহাড়া বসান। ফলে মাছ ধরা কৃষকদের ক্ষেত্রে একভাবে বন্ধই বলা যায়।

তৃতীয়ত, এই দুর্যোগের ফলে শুধু কৃষকরাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন তা নয়। এসকল এলাকার উপজেলা সদরের বাজার থেকে শুরু করে সুনামগঞ্জ জেলা শহরে অবস্থিত সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরও এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। এটি আস্তে আস্তে সামনে আসা শুরু হয়েছে, যত সময় যাবে এটি আরও তীব্র হবে। যেসকল কৃষিমজুর ফসল তোলার সময়ে মজুর খাটতো তারা কাজ পাবে না, কাপড়-জুতা-স্বর্ণ-মিষ্টি-বেকারিসহ বিভিন্ন ব্যবসায় ইতিমধ্যেই মন্দা শুরু হয়েছে। প্রথম ধাক্কায় এসকল জায়গা থেকে একটা বড় অংশের কর্মচারীরা কাজ হারাবেন। পরবর্তীতে অনেক ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হবেন। পুরো বছরব্যাপী এই প্রভাব থাকবে।

চতুর্থত, এই বিরাট অংশের বেকারত্ব, কর্মহীনতা, কোনরকমে টিকে থাকার জন্য যে কোন কিছু করার চেষ্টা- পুরো ব্যাপারটির সামাজিক প্রভাবও গভীর। এরকম পরিস্থিতিতে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ে, অন্যায়-অপকর্ম বাড়ে। ধীরে ধীরে এই প্রভাব ওই অঞ্চলের লোকেরা প্রত্যক্ষ করবে।

এসকল বিচারের ভিত্তিতেই ঠিক করতে হবে, একে দুর্গত এলাকা বলা যায় কিনা। কিছু নির্দিষ্ট প্যারামিটার মিললেই সেটা দুর্গত এলাকা হবে, না মিললে হবেনা- ব্যাপারটা এরকম নয়। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একাডেমিশিয়ানরাও ব্যাপারটা এভাবে দেখেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও সরকারের এমন ভাষ্য একবাক্যে নাকচ করেছেন। তবে এটাই সবচেয়ে নির্মম ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, একটি এলাকার বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবনে একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেলো এবং সামনে আরও বড় বিপর্যয় যেখানে অপেক্ষা করছে- সে অবস্থায় রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের মুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে। এদের পাশে সবকিছু নিয়ে দাঁড়ানোর কথা ছিলো যে রাষ্ট্রের তার ভূমিকা আজ প্রশ্নবিদ্ধ।

হাওরের ব্যাপারে সরকারের করণীয় কী?

হাওর অঞ্চল প্রচুর সম্পদে পরিপূর্ণ একটি অঞ্চল। দেশের বোরো ফসলের একটা বিরাট অংশ সে সরবরাহ করে শুধু তার জন্য নয়, দেশের মৎস্য সম্পদ, গবাদি পশু লালন-পালনের দিক থেকেও হাওর অঞ্চল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই হাওর অঞ্চলের লোকেদের না খেয়ে মারা যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু একটি সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবের কারণে হাওরের দুর্দশার আজ শেষ নেই। হাওর অঞ্চল ও তার আশেপাশের জেলাগুলোকে কেন্দ্র করে সরকারের একটি বিশেষ পরিকল্পনা থাকা দরকার। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাগুলোকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে এসেছে।

১. বন্যা প্রতিরোধের জন্য নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং এর উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে বন্যার পানি সে পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

২. হাওরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দিয়ে ফসল চাষ বন্ধ করা উচিত। মাছ চাষে গুরুত্ব দেয়া উচিত। মাছ আহরণের ক্ষেত্রে সবরকম প্রতিবন্ধকতা দুর করা উচিত এবং খালবিল লিজ দেয়া বন্ধ করে মৎসক্ষেত্রকে স্থানীয় আহরণকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত।

৩. ১২০ দিনে ঘরে তোলা যায় এমন উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের জাত আবিষ্কারের লক্ষ্যে চেষ্টা করা উচিত।

৪. মাছ, ধান ও হাঁস-মুরগীসহ নানাপ্রকার গবাদি পশু পালন- এই তিনটি বিভাগকে কেন্দ্র করে একটি সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা উচিত।

৫. বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটির বাঁধের পরিবর্তে স্থায়ী বাঁধ ভাবা উচিত যাতে এর উপর দিয়ে যোগাযোগব্যবস্থা দাঁড় করানো যায়।

আবারও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির অযৌক্তিক প্রস্তাব

(শেষ পৃষ্ঠার পর) **১১ টাকা ৬৭ পয়সা।** এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেডের বিদ্যুতের, ইউনিট প্রতি ২০ টাকা ৪০ পয়সা। এ কেন্দ্র থেকেই গত অর্থবছর সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ কিনেছে পিডিবি। বারাকা, ডিজিটাল পাওয়ার ও সিনহা পিপল এনার্জিসহ আরো কয়েকটি বেসরকারি কেন্দ্র থেকে ৭ থেকে সাড়ে ৭ টাকায় বিদ্যুৎ কেনার সুযোগ থাকলেও সেখান থেকে কেনা হয়েছে তুলনামূলক কম। যদিও স্বাভাবিক যুক্তি অনুযায়ী সাশ্রয়ী কেন্দ্র থেকে বেশি বিদ্যুৎ কেনার কথা। ২০১০ সালের ১ মার্চ থেকে ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকার পাইকারি পর্যায়ে ছয়বার ও গ্রাহক পর্যায়ে সাতবার দাম বাড়িয়েছে। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে এ সময় জ্বালানি তেলের দাম রেকর্ড পরিমাণ কমেছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। দেশে মোট বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৭টিতে। নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র যোগ হয়েছে ৭৪টি। এর মধ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র তথা আইপিপি ২৮টি। ২০১০-১১ অর্থবছরে বেসরকারি কেন্দ্র থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা শুরু হয়। ওই অর্থবছরই লোকসানে পড়ে পিডিবি। অর্থবছরটিতে পিডিবির লোকসান হয় ৬২ কোটি ৩০ লাখ ডলার। পরবর্তীতে লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা লোকসান করে পিডিবি। গত ছয় বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত এ সংস্থা লোকসান গুনেছে ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

সামগ্রিকভাবে সরকারের ভুল নীতি ও বেসরকারি মালিকদের মুনাফাবান্ধব/স্বার্থরক্ষার নীতি জনগণকে বার বার দুর্ভোগে নিপতিত করেছে। কারণ জনগণের দরকার তো ভোটে। তখন আশ্বাসে ভোলানো যাবে। আর ভোটের টাকা জোগাবে তো পুঁজিপতি/ব্যবসায়ীরা। ফলে দেশের স্বার্থ তো রক্ষা করতেই হবে! এখন আমরা আমাদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করবো, তা আমাদের ভাবতে হবে।

সিরিয়ায় বিমান ঘাঁটি হামলা, উত্তর কোরিয়ায় মার্কিন নৌবহর, বিশ্ববাসীর উদ্বেগ!!

(শেষ পৃষ্ঠার পর) জন প্রাণ হারিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ মাধ্যমে রাসায়নিক গ্যাসে বিপর্যস্ত মানুষের মৃতদেহ আর সেসকল মানুষদের দুঃসহ সব ছবি প্রচার করা হয়। এ ঘটনাকে অজুহাত করে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিতে UgnK মিসাইল আক্রমণ করে। রাশিয়া, চীন এমনকি মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্য থেকে দাবি ওঠে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। প্রেসিডেন্ট আসাদ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বারংবার বলেন যে, সিরিয়ায় ২০১৩ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ দল সকল রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করেছে যার ফলে সিরিয়ার সরকারের কাছে আর কোন রাসায়নিক অস্ত্র নেই। যদিও তিনি এই ঘটনা আদৌ ঘটেছে কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন এবং আহতদের বিভিন্ন ছবি তাঁকে দেখানো হলে তিনি সন্দিহান প্রকাশ করে বলেন এ ছবি কৃত্রিমও হতে পারে। তারপরও তিনি বলেন যে, ইতিমধ্যে জঙ্গীদের হাতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ আছে। যেহেতু সিরিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদ্যমান তাই যেকোন বাহিনীর অস্ত্র হামলায় রাসায়নিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে এ পরিস্থিতি ঘটতে পারে। কিন্তু এঘটনাকে অজুহাত করে যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিতে মিসাইল হামলা চালিয়ে পুরো বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করে দিল তাতে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই হামলা চালানোর জন্যই পরিকল্পিতভাবে সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র হামলার অজুহাত তুলেছে। এ ঘটনার অজুহাতে সিরিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিরপিত্তা পরিষদে অর্থনৈতিক অবরোধের প্রস্তাব দেয়া হয় যা রাশিয়া ও চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে বাতিল হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আসাদ ২০১২ সালে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসেন। রাশিয়া বহুকাল ধরে সিরিয়ার মিত্র শক্তি। তাই সিরিয়া সরকারের আহ্বানে রাশিয়া এগিয়ে আসে এবং জঙ্গী দমনে সিরিয়াকে সক্রিয় সামরিক সহায়তা প্রদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সিরিয়ায় জঙ্গী দমনের নামে বোমা বর্ষণ শুরু করেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আসাদের মতে জঙ্গী দমনে রাশিয়া যত কার্যকর ভূমিকা রাখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ততটাই বিতর্কিত। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জঙ্গী বাহিনীগুলোকে সরাসরি সামরিক সরঞ্জাম দিচ্ছে, সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং আল কায়েদা, আইএস প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আসাদ সরকারকে উচ্ছেদে লিপ্ত আছে। কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রেক্স টিলারসন এবিষয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেগরেই ল্যাভরভ এর সাথে বিবাদ এত তীব্র করে তুলেছে যে এর ফলে যুদ্ধকে আরো তীব্র করে তোলার জন্য কুটনৈতিক প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত বিপন্ন করে তুলছে।

এবার আসা যাক উত্তর কোরিয়া প্রসঙ্গে। বিশ্বের দশটি পরাশক্তির মধ্যে উত্তর কোরিয়ার অবস্থান দশম। তার দশটি পারমাণবিক অস্ত্র আছে। উত্তর কোরিয়া এখনও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ধরে রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রশিক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলো দীর্ঘদিন যাবত সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার উপর নানাকারণে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়ে যখন সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করলো তখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়ে উত্তর কোরিয়ার লোক অনাহারে মৃত্যুবরণও করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে উত্তর কোরিয়া সেদেশের জনগণকে একটি উন্নত জীবনমান দিতে পেরেছে। অধিকন্তু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কবল থেকে আত্মরক্ষার স্বার্থে শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তবে একথা না বলে পারা যায় না যে পাকিস্তান বা ভারত নব্য পরাশক্তিতে পরিণত হয়েই যেমন দেশের বুভুক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৯০-১১০টি পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয়েছে আর মানবতার দুশমন ইসরায়েল রাষ্ট্র ৮০টি পারমাণবিক বোমাসহ অপরাপর মারণাস্ত্রের নিষ্ঠুর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলোকে ভূলুণ্ঠিত করছে, উত্তর কোরিয়ার সামরিক প্রস্তুতি কেবলমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন থেকে। সম্প্রতি ট্যুরিস্ট বা সাংবাদিকদের তোলা ভিডিও ফুটেজ থেকে দেখা যায় সেদেশের হেক্টরের পর হেক্টর ফসলের মাঠ, অত্যাধুনিক শিল্প কারখানা, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি এবং সংস্কৃতি আর সুস্থ বিনোদনের প্রবাহ। এরই মধ্যে একদল সামরিক বিশেষজ্ঞ আবার দেশটি রক্ষার প্রয়োজনে সাধ্য অনুযায়ী সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর অংশ হিসাবে কিছু ক্ষেপনাস্ত্র উৎক্ষেপন, পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষণ ইত্যাদি রুটিন সম্পন্ন করছে। তাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অজুহাত পেয়ে গেল তার ভয়াবহ মারণাস্ত্রবহনকারী নৌবহর পাঠিয়ে দেয়ার। তার সাথে যোগ দিতে রওনা হয়ে গেল আর একটি যুদ্ধবাজ দেশ জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই জাপান কিভাবে মার্কিনীদের নাস্তনাবুদ করেছিল আর তা থেকে পরিত্রাণ পেতে তাদের ধর্ণা দিতে হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তীব্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাপানকে পরাজিত করে। যাই হোক, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা লে.জে. ম্যাকমাস্টার উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চরম উপেক্ষা হিসাবে গণ্য করে উস্কানীমূলক বক্তব্য দেন এবং উত্তর কোরিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক নিরাপত্তা হুমকিস্বরূপ বর্ণনা করেন। মাত্র ১০ টি পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে উত্তর কোরিয়া যদি প্রায় ৭৪০০ টি পারমাণবিক অস্ত্রধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয় আর যখন মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রকাশ্যে হুমকি প্রদান করছে ইরান, সিরিয়া, লেবাননসহ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলোকে আর মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি, স্বস্তি, ঐতিহ্য সবকিছু বিনষ্ট করছে তখন বুঝতে হবে এধরণের উক্তির পিছনে উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা নয়। এধরণের পরিস্থিতিতে ইসরায়েল নিরাপত্তা হুমকি না হয়ে প্রায় বিচ্ছিন্ন নির্ঝঞ্জাট একটি রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া যদি নিরাপত্তা হুমকি হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি করা এবং তা টিকিয়ে রেখে অস্ত্রের বাজারটি আরো চাঙ্গা করা।

মার্কিন অর্থনীতি হল নিরঙ্কুশভাবে সামরিক অর্থনীতি। তাই যুদ্ধ অথবা যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলে না। এলক্ষ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি, যুদ্ধ উন্মাদনা, মিথ্যা অপপ্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি করে অস্ত্রের বাজার সৃষ্টি এ সংস্থাটির একটি প্রধান কাজ। এর সাথে রয়েছে কর্পোরেট মিডিয়া, লবিইস্ট প্রভৃতি যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল-মিলিটারী কমপ্লেক্সের পক্ষে রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে কাজ করে। মার্কিন জনগণকে বিকৃত সংস্কৃতি আর কর্মচাঞ্চল্যের বেড়াজালে এমনভাবে আটকে রেখেছে যে এর মধ্যে থেকে সত্য উদঘাটন করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এত অনাচার মোকাবেলা করে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠির অনুচর হিসাবে দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত জনগোষ্ঠী। আবার অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন যুদ্ধনীতি বরদাস্ত না করার জন্য রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। মার্কিন জনগণ এর এ লড়াই সমগ্র বিশ্ববাসীর। মেহনতী মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সরকারের ছত্রছায়ায় চালের দাম বাড়াচ্ছে চালকল মালিক-মজুতদার-ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট

রেকর্ড শব্দটি শুনলে সাফল্যের কথা মনে আসে। কিন্তু এই বাংলাদেশে 'রেকর্ড' শব্দটি জন দুর্ভোগেরই আরেকটি প্রতিশব্দ যেন। চুরি-দুর্নীতি, অর্থপাচার নারী নির্যাতন চালের দাম অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। টিসিবি(ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) এর হিসাব মতে– মোটা, সরু সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে(গত বছরে এ সময়ের তুলনায়) ১৮-১২ টাকা। অর্থাৎ শুধু মাত্র চাল কেনা বাবদ একটি পরিবারকে অন্তত: ৪০০ টাকা (মাসে ৫০ কেজি চাল কিনলে) বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। চালের দাম এত বেশি কখনোই ছিল না।

বর্তমানে মোটা চালের দাম অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। চলতি বছরের ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ(টিসিবি) প্রকাশিত ১০ মে-র হিসাবে প্রতি কেজি মোটা চাল ৪২ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যা ২০১৬ সালের একইদিনে ছিল ৩০ থেকে ৩৪ টাকা। প্রতি কেজি সরু চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫৬ টাকা। যা ২০১৬ সালের এ দিনে ছিল ৪৪থেকে ৫৫ টাকা। নাজির বা মিনিকেটের সাধারণ চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫২ টাকা। যা ২০১৬ সালের এ দিনে ছিল ৪৪ থেকে ৪৮ টাকা। গত বছর বোরো মৌসুমের পর আগস্ট থেকে চালের দাম বাড়তে শুরু করেছিল, কিন্তু এবার তা এখনই রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। জানুয়ারিতে আমন ধানের চাল বাজারে উঠলেও বাজারের অস্থিরতা কমাতে পারেনি। এখন বোরোর চাল বাজারে আসতে শুরু করেছে। তারপরও চালের দাম কমছে না। এর আগে কয়েক বছর মোটা চালের খুচরা দর কেজি প্রতি ৩০-৩২ টাকার আশপাশে ছিল। মিনিকেট মিলত ৪২ থেকে ৪৪ টাকা দরে। অন্যদিকে মাঝারি আকারের চাল কেজি প্রতি ৩৬ থেকে ৩৮ টাকার মধ্যেই পাওয়া যেত। এ দামের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, একটি পরিবারকে মাসে ৫০ কেজি চাল কিনতে ৪০০ টাকা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেংদেনিং প্রোগ্রামের ওয়েবসাইটে দেওয়া ২০০৭ সাল থেকে চালের দাম ওঠানামার লেখচিত্রে দেখা যায়, চালের দাম এত বেশি কখনো ছিল না।

চালের দাম বাড়লে সব শ্রেণির ক্রেতাকেই সেই বাড়তি দামে চাল কিনতে হয়। এতে সবচেয়ে বিপাকে পড়ে নিম্নবিত্তের মানুষ এবং যাদের আয় সুনির্দিষ্ট। আয়-রোজগারের উপায় এমনিতেই সীমিত। যাদের নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা নেই এবং যারা মাস-মাইনের চাকুরে তারাই বেশি নাজুক অবস্থায় পড়ে। সংসার চালাতে গেলে খরচের কোনো শেষ নেই। পণ্য, সেবা ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। নিরুপায় হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো খরচ কমানো যায়, কিন্তু চালের খরচ কমানো যায় না। যত দামই হোক, জীবন বাঁচাতে চাল কিনতেই হয়। সরকারি হিসাবমতে, দেশে এখনও ৪ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। মোটা চালের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। শুধু দরিদ্র ও হতদরিদ্ররা নয়, চালের দাম বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরাও, বিশেষ করে যাদের আয় নির্দিষ্ট। চালের দামের উর্ধ্বগতির কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের মাছ-মাংস, ডিম, দুধ অর্থাৎ আমিষ জাতীয় খাবার কেনা অনেকটা কমিয়ে দিতে হবে। এতে তাদের পরিবারে, বিশেষ করে শিশু ও নারীদের মধ্যে পুষ্টির অভাব ঘটবে।

চালের দাম বাড়লেও এর সুফল পায়নি ধান উৎপাদনকারী কৃষক। কারণ কৃষক পর্যায় থেকে ন্যায্যমূল্যের চেয়ে কম দামে ধান কিনে মজুদ করা হয়েছে। এখন মজুদকৃত ধানের দাম বাড়িয়ে চালের বাজার থেকে অতি মুনাফা করছেন মিলমালিকরা। এছাড়া এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্থানীয় দালাল ও ফড়িয়ারাও। নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের অভাবে এই শক্তিশালী সিন্ডিকেট চক্রের কারসাজিতে দাম কমছে না। অথচ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশে এখন চালের দাম নিম্নমুখী ধারায় রয়েছে।

সার্বিকভাবে এই অঞ্চলের ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে এখন বাংলাদেশেই মোটা চালের দাম সবচেয়ে বেশি। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত থেকে ৫ শতাংশ ভাঙা সেদ্ধ চাল আমদানি করলে এখন দেশের বাজারে প্রতি কেজির সম্ভাব্য মূল্য দাঁড়াবে ৩২ টাকার কিছু বেশি। পাকিস্তান থেকে আনলে তা কেজি প্রতি প্রায় ৩৫ টাকা পড়বে। অন্যদিকে থাইল্যান্ড থেকে আতপ চাল আমদানি করলে প্রতি কেজি ৩২ টাকা ৪৪ পয়সা ও ভিয়েতনাম থেকে আনলে পড়বে ৩৩ টাকা ৬৪ পয়সা।

চলতি মৌসুমে ৭ লাখ টন ধান কিনবে সরকার। প্রতি কেজি ধানের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪ টাকা। অন্যদিকে ৮ লাখ টন চাল কেনা হবে সরকারিভাবে। এজন্য প্রতি কেজি চালের দাম ৩৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারী হিসাবে, চলতি মৌসুমে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে ২২ ও চালে ৩১ টাকা খরচ হয়েছে। উৎপাদন খরচ মাথায় রেখেই সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই হিসেবে প্রতি কেজিতে গড়ে ১০ টাকা বাড়তি দিয়ে চাল কিনছে ক্রেতারা। দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটির বেশি হলে ভিজিএফ/ভিজিডি/খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা জালের বাইরে থাকা পরিবারের সংখ্যা ৩ কোটির মত হবে। প্রত্যেক পরিবারে দিনে অন্তত: ২ কেজি চাল লাগলে ১০ টাকা বাড়তি দরে প্রতিদিন ৬০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে। এভাবে একমাসে অন্তত: ১৮০০ কোটি টাকা সাধারণ মানুষের পকেট থেকে মূল্য বৃদ্ধিকারী সিন্ডিকেট আত্মসাৎ করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে ৩ কোটি ৪৯ লাখ ৬৮ হাজার টন চাল উৎপাদিত হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে ২ লাখ ৫৮ হাজার টন বেশি। অর্থাৎ, দেশে বর্তমানে চালের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। কৃষকরা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা মৌসুমের শুরুতে ধান বিক্রি করেন, ধান কাটার মৌসুম শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে তারা চাল ক্রেতায় পরিণত হন। মৌসুমে কম দামে কেনা ধান-চাল এখন মজুদ আছে অটোরাইস মিলার, আড়তদার বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের গুদামে। চালের দর বৃদ্ধি বা কমা পুরোটাই এখন তাদের ওপর নির্ভর করছে। সরকারি গুদামে চালের *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে রংপুরে কনভেনশন অনুষ্ঠিত

ভারত কর্তৃক তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রসহ অভিন্ন নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশের উপর তার প্রভাব ও আমাদের করণীয় শীর্ষক কনভেনশন ১৬ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় রংপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী কনভেশনে কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ। আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, জল পরিবেশ ইন্সটিটিউট এর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, বিশিষ্ট নদী গবেষক মাহবুব উদ্দিন সিদ্দিকী, কারমাইকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. রেজাউল হক, সিপিবির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রবীণ রাজনৈতিক কমরেড শাহাদৎ হোসেন সাবেক উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোজাহার আলী, অধ্যাপক আব্দুস সোবাহান, এ্যাড. মনির চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন, ডা. মফিজুল ইসলাম মান্টুসহ বিভিন্ন বাম-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু।

আবারও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির অযৌক্তিক প্রস্তাব

সব পর্যায়ে আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ চলছে। জানা গেছে, সব কয়টি বিতরণ কোম্পানি খুচরা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে সব ধরনের কাগজপত্র পেলে আগামী জুনের মধ্যে গণশুনানি করে নতুন মূল্যহার ঘোষণা হতে পারে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিইআরসি এবং পিডিবি সূত্র জানায়, বর্তমানে প্রতি ইউনিট (কিলোওয়াট) বিদ্যুতের গড়ে খুচরা মূল্য ৬ টাকা ৭৩ পয়সা গত বৃহস্পতিবার ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে পিডিবি। ডিমান্ড চার্জ ও সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধিসহ প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম অন্ততঃ ৭ টাকা ৭১ পয়সা নির্ধারণ করতে চায় সংস্থাটি অর্থাৎ প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ১৪.৫৬ শতাংশ বা ৯৮ পয়সা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

দাম বাড়ানোর যুক্তি নেই, বরং কমানোর সুযোগ আছে

গ্যাসের পর বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানান, বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের প্রাইসটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুতের দামও আমরা অ্যাডজাস্ট করতে চাই। অথচ, গত ফেব্রুয়ারিতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সময় বিইআরসির এক মূল্যায়নেই বলা হয়েছে তেলের দাম কমায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় কমেছে ৩৪ পয়সা। আর বিদ্যুৎ উৎপাদনে দুই ধাপে গ্যাসের মূল্য বাড়বে ১২.০৬ শতাংশ। এর ফলে প্রতি ইউনিটে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে ৩৪ পয়সা। অর্থাৎ সার্বিকভাবে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়ে পড়বে না। গ্যাসের দাম বাড়ায় যে খরচ বাড়বে, তেলের দাম কমায় তা মিটে যাবে। আর আন্তর্জাতিক বাজার বিবেচনায় নিলে তেলের দাম আরো কমানোর সুযোগ সরকারের হাতে রয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে অধিকাংশ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো লভ্যাংশে রয়েছে। ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পিডিবি ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ছাড়া বাকি চারটি কোম্পানিই লাভজনক অবস্থানে রয়েছে। উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়াকে দাম বাড়ানোর কারণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতি আদৌ তা নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে যে দামে জ্বালানি তেল বিক্রি হচ্ছে, তাকে বিবেচনায় নিলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বাড়ার কোনো কারণ নেই। ফলে 'লোকসান' বা উৎপাদন খরচের তুলনায় কম দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করতে গিয়ে 'ভর্তুকি' দেওয়ারও কোনো কারণ নেই। বলা যায়, জ্বালানি তেল বিক্রির ক্ষেত্রে সরকার বিপিসির মাধ্যমে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় মুনাফা করার যে নীতি নিয়েছে, তাকেই এখন বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে।

বিদ্যুৎখাত ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়ার পরিণামে বার বার মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে

পিডিবির সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ফার্নেস অয়েলভিত্তিক ১৫টি বেসরকারি কেন্দ্রের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের গড় দাম *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অক্টোবর বিপ্লবের শততম বার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কমিটি গঠিত

২০১৭ সালেই উদযাপিত হতে যাচ্ছে মহান রুশ বিপ্লবের শততম বর্ষপূর্তি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর ঘটানো এই বিপ্লবটি উদযাপনের জন্য বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করা হচ্ছে নানান কর্মসূচি। বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক আয়োজন ও লাল পতাকা মিছিলসহ নানান কর্মসূচি পালন করা হবে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রুশ বিপ্লবের শততম বর্ষপূর্তি উদযাপনের লক্ষ্যে সকাল ১১টায় অধ্যাপকসিরাজুলইসলাম চৌধুরী ও ভাষাসংগ্রামী ও লেখক আহমেদ রফিকের যৌথ আহবানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী, রাজনীতিবিদ হায়দার আকবর খান রনো, খালেকুজ্জামান, জোনায়েদ সাকি, শুভ্রাংশুচক্রবর্তী, বজলুর রশীদ ফিরোজ, ফিরোজ আহমেদ, হামিদুল হক, মফিজুর রহমান লালটু, অভিনু কিবরিয়া ইসলাম, মাজহারুল ইসলাম বাবলা প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে তোপখানা রোডস্থ নির্মল সেন মিলনায়তনকে অক্টোবর বিপ্লবের শততম বার্ষিকী আয়োজক কমিটির অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন কমিটির কাজকে সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ গঠনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, এই পরিচালনা পরিষদ অচিরেই দেশের শ্রমিক-ছাত্র-নারীসহ পেশাজীবীসংগঠন ও ব্যক্তিত্বদের সাথে বৈঠক করে অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপনের কর্মসূচি নির্ধারণ ও পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বাংলাদেশে রুশ বিপ্লবের শততম বার্ষিকীতে কয়েকদিন ব্যাপী জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মসূচি পালন করার জন্য শতবর্ষ উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আহমদ রফিক সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

সিরিয়ায় বিমান ঘাঁটিতে হামলা, উত্তর কোরিয়ায় মার্কিন নৌবহর ও বিশ্ববাসীর উদ্বেগ!!

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার প্রায় একশত দিন শেষ হল। এরই মধ্যে নাভিশ্বাস উঠছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বের নাগরিকদের। ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে যখন তাঁর বিজয় প্রায় আসন্ন তখনই মানুষের মাঝে "কি হবে! কি হবে!" রব উঠেছিল। সমগ্র বিশ্বে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বাইরে যে বিপুল, বিশাল বিবেকসম্পন্ন মানুষ তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ, প্রাক্তন হলিউড খলনায়ক, ধনকুবের, অরাজনৈতিক, দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকবলিত বিশ্ব যে আরো অধিকতর সংকটে নিমজ্জিত হবে তা সকলেই বুঝতে পারছিল। তারপরও মানুষ হয়তো ভাবেনি যে এত দ্রুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করবে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৭ তে পেনসেলভিনিয়া অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্প ১০০ দিন পূর্তির বক্তব্য রাখলেন। তাঁর সমগ্র বক্তব্য ছিল আস্ফালনে পরিপূর্ণ। কত দ্রুততার সাথে কত আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার ফিরিস্তি। যেভাবে হিটলার জার্মানীতে উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল তেমনি ট্রাম্পের স্লোগান হল, "Make America Great Again!"। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে একটি মহৎ মার্কিন জাতিকে, তার মেহনতি জনতাকে মার্কিন কর্পোরেট পুঁজির সেবাদাসে পরিণত করতে চাইছে। মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি যদিও পূর্বের উত্তরসূরীদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে তারপরও ম্যাক্সিকো বর্ডার রক্ষার নামে দেয়াল নির্মাণ, নাফটা চুক্তি ভেঙে দেয়ার পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য, ট্রান্স প্যাসিফিক চুক্তির মারমুখী সমালোচনা, বৈধ-অবৈধ ইমিগ্রেন্টদের বিতাড়িত করতে উদ্যত হওয়া, তীব্রভাবে বর্ণবাদ উস্কে দিয়ে খুনোখুনির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, ইউরোপে নব্য ফ্যাসিবাদের সাথে মাখামাখি প্রভৃতি আলামাত দেখলে বোঝা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন একেবারেই ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশ পরিচালনা করতে চাইছে। হিটলারের মত অপরাপর দেশগুলির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক এড়িয়ে গিয়ে অস্ত্র আর অর্থনৈতিক অবরোধকে এই প্রশাসন মূল হাতিয়ার করতে উদ্যত। পূর্বেকার প্রশাসন হয়তোবা এক্ষেত্রে কিছুটা নরমপন্থা অবলম্বন করেছে কিন্তু বর্তমান প্রশাসন ক্ষমতায় এসে পূর্বেকার প্রশাসনের সামরিক অর্থনীতিতে বরাদ্দ হ্রাস (sequestration) বাতিলকরণ, অস্ত্র হ্রাস বাতিলকরণ, আগাম যুদ্ধনীতি অবলম্বন প্রভৃতির মাধ্যমে এমন এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরী করেছে যে মার্কিন প্রশাসনে এখন আর অণুপরিমাণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যেতে চাইছে না।

এ প্রেক্ষাপটে আসা যাক্ এই মূহুর্তের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যু - সিরিয়া আর উত্তর কোরিয়া প্রসঙ্গে। সিরিয়ায় গত ৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ইদলিব প্রদেশের খান শেখউন অঞ্চলে রাসায়নিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। কারা এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে? গত মার্চ মাসে চীনের সংবাদ মাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট বাসার-আল-আসাদ সন্তোষের সাথে আলেপ্পো পুনঃদখলের বিষয়টি আলোচনায় আনেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাথ পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার যে চরম মৌলবাদী গোষ্ঠীসমূহ অর্থাৎ আই এস, আল নুসরাহ, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি প্রভৃতি শক্তিকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জনের দিকে এগোচ্ছিলেন তার বিবরণ করছিলেন। ঠিক সেরকম একটি সময়ে সিরিয়ায় তথাকথিত রাসায়নিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সংবাদ মাধ্যমে বলা হয় আশি *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org